গরমে ত্বকের রোগ

গরমকালে যে ক'টি চর্মরোগ সবচেয়ে বেশি দেখা যায়, তার মধ্যে ঘামাচির পরই ছত্রাকজনিত চর্মরোগ অন্যতম। গরমকালে এই রোগটি বেশি হয়। কারণ গরমকালে বেশি ঘাম হয় এবং শরীর ভেজা থাকে। ঘাম ও ভেজা শরীরই হলো ছত্রাক জন্মানোর উর্বর ক্ষেত্র। যারা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে ততটা সজাগ নন, এই রোগটি তাদের বেশি হতে দেয়া যায়।

বিশ্বব্যাপী পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, এক-তৃতীয়াংশ লোক এই রোগে আক্রান্ত হয়। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে এ রোগে আক্রমণের হার শীতপ্রধান দেশের চেয়ে বেশি। আমাদের দেশে অন্তত ৭০-৮০ হাজার লোক প্রতি বছর এ রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে। রোগটির ক্ষেত্রে একটি হতাশার দিকও আছে। এ রোগটির চিকিৎসা দেয়া হলে খুব সহজেই ভালো হয়ে যায়; কিন্তু কিছু দিন যেতে না যেতেই পুনরায় দেখা যায়। আবার বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ভালো হওয়া মাত্রই রোগী ওষুধ খাওয়া বন্ধ করে দেন। আবার যারা ঠিকমতো ওষুধ ব্যবহার করেন, কিন্তু তাদের ব্যবহৃত কাপড়চোপড় থেকে পুনরায় ছত্রাক দেহে প্রবেশ করে এবং সে কারণেই এ রোগটি কিছু দিনের মধ্যে আবার দেখা দিয়ে থাকে।

ছত্রাকজনিত যেসব চর্মরোগ আমাদের দেশে দেখা যায়, সেগুলো মূলত তিনটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। দাদ, ছুলি ও ক্যানডিডিয়াসিস। এ তিন ধরনের ছত্রাক প্রজাতির সবাই মূলত ত্বকের বাইরের অংশকে আক্রমণ করে এবং সেই আক্রমণ স্যাঁতসেঁতে, নোংরা, ঘর্মাক্ত দেহে সবচেয়ে বেশি হতে দেখা যায়।

দাদ

দাদ শরীরের যেকোনো অংশে দেখা দিতে পারে। যে অংশে দেখা যায় সেই অংশটিতে গোলাকার চাকার দাগ দেখা যায়। যার মধ্যেখানের চামড়া প্রায় স্বাভাবিক আকারে দেখতে হলেও গোল দাগের পরিধিতে উঁচু বর্ডার লাইন আকারে থাকে এবং চুলকালে সেখান থেকে কষ ঝরতে থাকে।

শরীরের যেকোনো অংশে এর আক্রমণ ঘটতে পারে। তবে দেখা গেছে, সাধারণত তলপেট, পেট, কোমর, নিতম্ব, পিঠ, মাথা, কুঁচকি ইত্যাদি অংশে বেশি আক্রান্ত হয়। আক্রমণের স্থান লক্ষ করে একে স্থানভিত্তিক বিভিন্ন নামে নামকরণ করা হয়েছে। যেমন– মাথায় যখন ডার্মাটোফাইট জাতীয় ছত্রাকের আক্রমণ হয়, তখন তাকে বলা হয় টিনিয়া ম্যানাস, নখে হলে তাকে বলা হয় টিনিয়া আংমায়, শরীরের অংশবিশেষ আক্রান্ত হলে বলা হয় টিনিয়া কর্পোরিস।

রোগ নির্ণয় : আক্রান্ত স্থানে চামড়া একটু ঘষে তুলে নিয়ে একটি গ্লাস স্লাইডের ওপরে রাখতে হবে। মাইক্রোস্কোপের নিচে এটা যে ফাংগাস বা ছত্রাক, তা খুব সহজেই নিরূপণ করা সম্ভব।

টিনিয়া ভারসিকলার বা ছুলি

এটিও একটি ছত্রাকজনিত রোগ। গরমকালে এ রোগে মানুষ বেশি আক্রান্ত হয়, শীতকালে আবার এমনিতেই যেন মিলিয়ে যায়। আবার গরম এলে গায়ের চামড়া ভিজে থাকে। তখনই আবার দেখা দেয়। হালকা, বাদামি সাদা গোলাকৃতির দাগ দেখা যায়। বুকে, গলার দুই পাশে, ঘাড়ের পেছনে, পিঠে, বগলের নিচে, এমনকি সারা শরীরেও হতে পারে। এতে ত্বক দেখতে সাদা হয়। তাই অনেকে আবার একে শ্বেতি ভাবতে শুরু করেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে শ্বেতির সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই।

ক্যানডিডিয়াসিস

এটি একটি ছত্রাকজনিত চর্মরোগ। যাদের শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম, যেমন শিশু, বৃদ্ধ কিংবা রোগাক্রান্ত, ডায়াবেটিসে আক্রান্ত, দীর্ঘ দিন ধরে যারা স্টেরয়েড-জাতীয় ওষুধ ব্যবহার করছেন কিংবা যাদের ত্বকে খাঁজ পানিতে বা ঘামে সব সময় ভেজা থাকে তাদেরই এই রোগটি বেশি হয়। যারা সব সময় পানি নাড়াচাড়া করেন, তাদের আঙুলের ফাঁকে, হাতের ভাঁজে, শিশুদের জিহ্বায়, মহিলাদের যোনিপথে এবং গর্ভবতী মহিলারা এতে বেশি আক্রান্ত হয়ে থাকেন। এতে ত্বকের আক্রান্ত স্থান একটু লালচে ধরনের দেখা যায় এবং সাথে প্রচণ্ড চুলকানি থাকে।

চিকিৎসা : চিকিৎসা নির্ভর করে আক্রমণের স্থান ও আক্রমণের তীব্রতার ওপর। ক্যানডিডিয়াসিসের ক্ষেত্রে কেটোকোনাজল ও ফ্লুকোনাজল ব্যবহারে ভালো ফল পাওয়া যায়। ছুলির ক্ষেত্রে একই ওষুধ ব্যবহার করতে হয়। এ ছাড়া দাউদের ক্ষেত্রে Griseofulvin সহ ওপরে উল্লেখিত দু'টি ওষুধের যেকোনোটি ব্যবহার করলেই ভালো ফল পাওয়া যায়।

স্কেবিস বা খুজলি-পাঁচড়া রোগ

যে জীবাণু দিয়ে এ রোগটি হয়, তার নাম সারকপটিস স্কেবিয়াই।

এই জীবাণুগুলোর একটি বিশেষত্ব, পুরুষ কীটটি যৌন মিলনের পর মারা যায়। বেঁচে থাকে স্ত্রী কীট। সেই স্ত্রী কীট থাকে চামড়ার বহিঃত্বকের মধ্যে সুতার মতো লম্বা আকৃতির গর্তনালীর মধ্যে। সেখানে প্রতিদিন ১০-১৫টি ডিম পাড়ে। ৩-৪ দিনের মধ্যেই আবার সেই কীটগুলো বেরিয়ে আসে। ১০ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে এই শিশু কীটগুলো পূর্ণবয়স্ক কীটে পরিণত হয়।

কিভাবে ছড়ায় : এ রোগটি মানুষ থেকে মানুষের দেহে ছড়ায়। অন্য কোনো প্রাণীর মাধ্যমে এ রোগটি ছড়াতে পারে না অর্থাৎ যারা ঘনবসতিপূর্ণ ঘরে একত্রে বসবাস করেন, যেমন– স্কুল, হোস্টেল, মাদরাসা, এতিমখানা, বস্তি এলাকা। আবার যারা অপরিছন্ন জীবন যাপন করে তাদেরই এ রোগটি বেশি হয়। তাই বলে শুধু যে অপরিচ্ছন্ন থাকলে এ রোগ বেশি হয়, এটা কিন্তু মোটেই ঠিক না। একসাথে বিছানায় শুলে কিংবা ব্যবহৃত কাপড় অন্য কেউ ব্যবহার করলে খুব সহজেই এ রোগটি হতে পারে। কারণ, এ জীবাণুটি ব্যবহৃত কাপড়ের মধ্যে দুই দিন পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারে। যেকোনো বয়সের লোকই এ রোগে আক্রান্ত হতে পারে। তবে শিশু আর কিশোর-কিশোরীরাই এ রোগের শিকার বেশি হয়ে থাকে।

উপসর্গ : সবচেয়ে প্রধান যে উপসর্গ এ রোগের ক্ষেত্রে দেখা যায়, সেটি হলো চুলকানি এবং রাতের বেলায়ই অধিক চুলকায়। স্কেবিন নামক একটি পদার্থ জীবাণু দেহ থেকে নিঃসৃত হয়, সেটাই মূলত চুলকানির জন্য দায়ী এবং এত বেশি চুলকায় যে, স্বাভাবিকভাবে রাতের ঘুম ব্যাহত হয়। রোগীর দেহ ভালো করে লক্ষ করলে গোটা গোটা দানা দেখা যাবে। সেটা যেকোনো স্থানেই দেখা যেতে পারে। তবে হাতের আঙুলের ভাঁজে, কনুই, তলপেটে, পুরুষাঙ্গে, পায়ে, হাতের তালুর প্রান্তে বেশি দেখা যায়। তবে বিশেষভাবে শিশুদের ক্ষেত্রে খুব ভালো করে লক্ষ করলে সুতার মতো লম্বা দাগ দেখা যায়। বিশেষ করে হাতের ত্বকে যেটাকে Burrow বলা হয়। সেই নালীর শেষ প্রান্তে একটি অতি ক্ষুদ্র কালো দাগ দেখা যেতে পারে, যদি একটি Magnifying কাচ দিয়ে দেখা যায় তাহলে দাগের মাথায় একটি কালো বৃত্তের মতো দাগ দেখা যায়, সেটাই হলো সারকপটিস স্কেবিয়াই নামক Prasite. যেকোনো স্থানেই এই Burrow বা নালী গর্ত দেখা দিলেও মূলত হাতের কনুই, নাভির প্রান্তে, যৌনাঙ্গ, স্তনের বোঁটায়, বগলের ত্বকে এই নীল গর্ত বেশি দেখা যায়।

আক্রান্ত হওয়ার কিছু দিন পর বিশেষ করে শিশুদের ক্ষেত্রে লোমকূপের গোড়া বিভিন্ন জীবাণু যেমন– স্টেফাইলোকক্কাস ও স্ট্রেপটোকক্কাস নামক জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হয়। ফলে ফোড়ার মতো গোটা দেখা যায়। এ ছাড়া ত্বকের গভীর ক্ষত দেখা দেয়, এমনকি ত্বকের সেলুলাইটিসও দেখা দিতে পারে। শিশুদের ক্ষেত্রে একটু দীর্ঘস্থায়ী হলে এর থেকে ক্রনিক একজিমার সৃষ্টি হয়। এ ছাড়াও শিশুদের এর প্রতিক্রিয়ায় কিডনী রোগ গ্লোমেরুলোনেফ্রাইটিস হতে পারে। এ রোগকে নির্ণয় করতে হলে রোগী থেকে সব শুনতে হবে এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ভালোভাবে পরীক্ষা করতে হবে। খুঁজে দেখতে হবে Burrow বা নীলগর্ত পাওয়া যায় কি না। সাধারণভাবে জীবাণু শরীরে ঢোকার পর চুলকানি শুরু হবে এবং রাতের বেলায় প্রচণ্ড রকম চুলকাবে। নীলগর্ত থেকে সুচ দিয়ে পরজীবী বের করে মাইক্রোস্কোপের নিচে দেখলে জীবাণুটিকে স্পষ্ট দেখা যায়। রোগী আক্রান্ত হওয়ার কয়েক সপ্তাহ পর কিংবা পূর্ণ আক্রমণ ঘটলে সে ক্ষেত্রে চুলকানি পরিমাণ কম থাকতে পারে। তবে একটি কথা বলা খুবই প্রয়োজন, যদিও রোগটির নাম অনেকের চেনা বা জানা তবে এ রোগটির নির্ণয় করা কিন্তু খুব একটা সহজ ব্যাপার নয়। বিশেষ করে রোগটি যদি একটু দীর্ঘস্থায়ী হয়।

চিকিৎসা : বিভিন্নভাবে বিভিন্ন মাধ্যমে এ রোগটির চিকিৎসা করা চলে। যেমন– ৫ ভাগ পারমিথ্রিন, ১ ভাগ গামা বেনজিন, হেক্সাক্লোরাইড কিংবা ২৫ ভাগ সালফার ভ্যাসলিনের সাথে মিশিয়ে ব্যবহার করা যায়। তবে এসব ওষুধ ব্যবহারের আগে রোগীকে খুব ভালো করে সাবান মেখে গোসল করে নিতে হবে। তারপর মুখমণ্ডল বাদে ঘাড় থেকে শুরু করে সারা শরীরে ওই ওষুধ মাখতে হবে এবং আগে ব্যবহার করা সব কাপড় ১০ মিনিট ধরে গরম পানিতে ফুটিয়ে ধুয়ে নিতে হবে। এই চিকিৎসা পরিবারের সবাইকে নিতে হবে।

প্রফেসর ডা: জাকির হোসাইন গালিব
এমবিবিএস, এমডি (ডার্মাটোলজি)
বিভাগীয় প্রধান, চর্ম ও যৌন রোগ বিভাগ,
স্যার সলিমুল্লাহ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল
চেম্বার : ইবনে সিনা ডায়াগনস্টিক অ্যান্ড ইমেজিং সেন্টার
বাড়ি-৪৮, রোড-৯/এ, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯
ফোন : ৯১২৮৮৩৫-৭, ০১৭১১৩১২৭১৮